কবি নয় লোকটা

অনুপকুমার আচার্য

কবি নয়, লোকটা

অনুপকুমার আচার্য

বিশ্বজ্ঞান
৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ॥ বইমেলা ২০০১ ॥ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক ॥ দেবকুমার বসু

বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

গ্রন্থস্বত্ব ॥ নীলিমা আচার্য

লেজার সেটিং ॥ ডায়নামিক

৫৫বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ ॥ নিউ রূপলেখা প্রেস

৬০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

KABI NOY, LOKTA

a collection of Poems by

Anupkumar Acharya

ISBN-81-87329-50-5

প্রচ্ছদ শিল্পী ॥ চারু খান

মূল্য ॥ চল্লিশ টাকা

পূজনীয় পিতৃদেব

জ্যোতিষচন্দ্র আচার্য

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সপ্রসঙ্গ

মনে পড়ছে, সেই বালকের কথা। সুদূর অতীতে গ্রীষ্মের সকাল-বিকেল যার কেটে যেত অখ্যাত মফঃস্বল জনপদের জলাশয় তীরে। সাঁতার না-জানা বালকের চোখে অপার বিস্ময় ও আনন্দ, দুর্মর কৌতূহল আর কৌতুক খেলা করত বয়সে কমবেশি বড়দের যথেচ্ছ জলকেলির দৃশ্যে। জলরঙের সেই জলছবি আজও বুকের দেয়ালে অমলিন। তোলপাড় করে ওঠে আজও, হঠাৎই কোন দুরন্ত ধাক্কায় জলে পড়ে যাবার স্মৃতি ও অনুভূতি। যেন পালকের মতো মুহূর্তগুলির আচমকা ভোলবদল পাথরের অবয়বে।

কেন জানি না, প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ভাবনাসূত্রে মনে পড়ছে সেই সাঁতার না-জানা বালকের কথা। প্রায়শ মনে হচ্ছে, নির্বাচনের চেয়ে নির্বাসন সহজতর।

কবিতা কি এবং কেন—এ বিষয়ে অজস্র স্মরণযোগ্য ব্যাখ্যা আছে অগ্রজ অনেক বরেণ্য কলমে। সেই সব শিরোধার্য করেও, আমার মনে হয়, কবিতা বোধ হয় মুহূর্তের এবং চিরকালের—একই সঙ্গে। এই বোধও যদি উদ্ধৃতির মতো শোনায়—সুধী সহৃদয়ের কাছে ধৃষ্টতা মার্জনার অনুরোধ থাকল।

আরও একটি প্রতীতির কথা : কবিতা কল্পনালতা নয়—এ কথা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সময়নিরপেক্ষ হয়েও কবিতা কখনও সমকালের এবং শেষ পর্যন্ত চিরন্তন মানুষের। এবং এই নিরিখেই কবিতার সম্ভাবনা এবং পরমায়ু আকাশ কিংবা সমুদ্রের সীমারেখার মতো!

দু'চারটি প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকা ছাড়া, খ্যাত-অখ্যাত পত্রে প্রকাশিত কবিতা নিয়েই এই কাব্যগ্রন্থ। তার মধ্যে 'পরিচয়'-এর মতো ঐতিহ্যবাহী

সম্পন্নের পাশে 'কবিতা সীমান্ত', 'আবর্ত', 'এবং', 'অনুভব', 'কৃশানু'র মতো নিজস্ব চরিত্রে স্বতন্ত্র, সমুজ্জ্বল পত্রিকাও আছে। এদের সঙ্গেই অধুনালুপ্ত 'লোকসেবক', 'জনমত', 'দ্বীপবাণী' সমেত শহর ও শহরতলির অখ্যাত, অল্প-খ্যাতদের সহাবস্থান। রচনার কালক্রমকেই বিন্যাসের সূচক করা হয়েছে। সব লেখাই সত্তরের শেষার্ধ থেকে প্রায় শতাব্দী ছোঁয়া সময়ের প্রয়াস মাত্র।

এবার ঋণ স্বীকারের পালা। এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টায় প্রাবন্ধিক ও গবেষক ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, গল্পকার রত্নেশ্বর বর্মন এবং প্রভাস ভদ্রের মতো অগ্রজদের নিরন্তর প্রেরণার পাশাপাশি স্নেহভাজন গল্পকার সুভাষ বিশ্বাসের আন্তরিক প্রয়াসের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

একই কথা সাংবাদিক-লেখক পিনাকীরঞ্জন গুহ এবং এই সময়ের এক অতন্দ্র পাঠক অগ্রজ অমলকৃষ্ণ গুহ সম্পর্কেও। সবশেষে, প্রকাশক শ্রদ্ধেয় দেবকুমার বসুর সস্নেহ প্রশ্রয়ের উল্লেখ না করলে এই স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণ হবে না।

কবিতার গার্হস্থ্যে দু'দশকের বেশি অতিবাহিত হলেও 'কবি' শব্দটির ভার এখনও বিষম মনে হয়। তবু, যদি কোন রচনা কবিতা হয়ে ওঠে কিংবা নিদেনপক্ষে কোন স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তিও পাঠককে আলোড়িত করে মুহূর্তের জন্যে, তার সব সার্থকতাই কিন্তু 'কবি' নয়, 'লোকটা'র।

৩১ শে জানুয়ারি, ২০০১ — অনুপকুমার আচার্য

।। সূচীপত্র ।।

দিনযাপন

এইভাবে দিন যায়।
সকালের জলে যত অকালের মেঘ
অহেতুক ভেসে যায়;
হতোদ্যম হাঁসের আবেগ
অবসাদে ঘুমোয়ও যদি,
অলস দীর্ঘ বেলার বয়স
হেঁটে যায় নিরবধি
কালের দিকে। নিয়তির মোরগেরা কর্কশ
ডাকাডাকি করে
রক্তের ভেতর। গোপন দুঃখে নিঃস্ব পাতা
যত ঝরে পড়ে।
এই অবেলায়ও আজন্ম ব্যথা
শুধু কান পেতে থাকে
মর্মে আমার : শূন্য বন্দরে ভিড়ে সওদা-জাহাজ
এই বুঝি ডাকে!

প্রেমিকা

এখনও নামেনি শীত,
নীলাভ কুয়াশা তবু জমে ওঠে
রক্তে আমার;
হিমেল হাওয়ার মতো
বিছানা-বালিশে লিপ্ত বিনিদ্র পিপাসা
শুষে নেয় সমুদয় ত্বকের আরাম;
অথচ কিছুই ঘটে না।
আরও কত শীত যাবে শীতের মতো!
অভ্যাসে টের পাবো
কাছাকাছি পড়ে থাকা পরিত্যক্ত খোলসের ঘ্রাণ।

অথচ কারও যেন কথা ছিল বিকেলে আসার!
অভিমান ছুঁয়ে যায় বিষণ্ণ গণিকা।
দাঁড়াও!
অচঞ্চল কে ডাকে? নিরবধিকালের প্রেমিকা।

ছন্দে নয় তো, দ্বন্দ্বে আছি

দুই দরজায় ঝুলছে তালা
হাতের কাছে একটি চাবি,
দিন চলে যায় রাত চলে যায়
ডুব সাঁতারে কেবল ভাবি।
দ্বিতল বাড়ি একচালা ঘর
কিসের ছায়ায় সে প্রত্যাশা,
অবহেলার এইটুকু গাছ
যত্ন চায় না ভালবাসা?
দশদিকে তাই পাঠিয়ে চিঠি
ডাকের আশায় তাকিয়ে বাঁচি,
সাধ্য কী আর ছন্দে থাকি
ছন্দে নয় তো, দ্বন্দ্বে আছি।

কবিকে ডেকো না

অন্ধ কুয়াশায় ভিজে উঠেছে মাঠ-ঘাট,
কবি তা' পেরিয়ে যাবেন ওইখানে
দিগন্তের কাছে
যেখানে মাথার ওপর ঝুলে আছে ত্রয়োদশী চাঁদ;
কবিকে ডেকো না কেউ।

জলদ সময়ের টানে শুকিয়ে যাচ্ছে স্রোত,
কবি তা' পেরিয়ে যাবেন ওইখানে
উঠোনের কাছে
যেখানে উদ্যত পা রেখেছে হতমান শিশু;
কবিকে ডেকো না কেউ।

অলস নৈরাজ্যের ধুলোয় ভরে উঠেছে ঘর-বাড়ি,
কবি তা' ডিঙিয়ে যাবেন ওইখানে
বাগানের কাছে
যেখানে বিধবা যুবতী তুলেছে কাঠ-টগরের মেলা;
কবিকে ডেকো না কেউ।

ঠাট্টা

সমুদ্রকে বলিনি, থামো—
তবু যেন লেগে থাকে নিঃস্বতার নোনা স্বাদ

গাছকে বলিনি তো, সরো—
দুঃখের মাচাল ফুল মিথ্যেই ঝরে যায় কত

নারীকে বলেছি নাকি, দ্যাখো—
তবে কেন দ্রুত হাতে চোখ মুছে রুমাল ওড়াবে

রাজাকে বলিনি তো, শোন—
অনুতপ্ত চিঠি কেন অহেতুক ইনিয়ে বিনিয়ে

কাউকে বলেছি কখনও, কাঁদো—
তবে কেন নিরর্থক হেঁটে গেলে অর্থপূর্ণ হাসে।

কবি নয়, লোকটা

নিঃশর্ত নয়, তবু বাঁচার জন্য
অনেক অরণ্য
এবং বন
পেরিয়েও কিছু শস্যদায়ী ক্ষণ
আর অসামান্য কুমারী জমি পড়ে আছে।
মসুরি-পালং যা বুনেছি, যদি বাঁচে
ভেবেছি, সোনা-দানা আর নয়—
যা কিছু অপচয়
হয় হোক। এ জীবন বেশ কেটে যাবে।
ঠিক যে ভাবে
পরাণ মালীর দিন গেছে, দিন যায়।
হায়!
আমারও কি ভুল
হবে যদি কিছু রেখে যেতে পারি রক্ত ও মননের ফুল?
কার ছিল? কে রেখে গেল? চেঁচালেও শোক
নেই, যদি কেউ বলে দেয়, আটটা-দশের গাড়ির জন্য দৌড়োত, যে লোক।

হাত বাড়ানো পা বাড়ানো

কখনও কখনও
কোনদিকে হাত বাড়ানো মানেই কোনদিকে পা বাড়ানো।

মনে আছে, শৈশবে—
অপার কৌতূহলে রঙিন প্রজাপতির দিকে হাত বাড়িয়ে
পায়ের কাছে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম নীল শুঁয়োপোকা।

আরও পরে, কৈশোরে—
ঋজু হাতে নীরক্ত খেজুর কুড়োতে গিয়ে
অখণ্ড কাঁটা বিঁধেছিল পায়ে।

আর এখন, যৌবনে—
প্রায়শ স্বচ্ছ স্রোতের দিকে যাব বলে
আবর্তে ডুবে যাই, ডুবে থাকি; ভেসে উঠি ফের।

কখনও কখনও
কোনদিকে হাত বাড়ানো মানেই কোনদিকে পা বাড়ানো।

প্রথম প্রেম

শুধু বেঁচে বর্তে থাকা—সে তো বহুদিন আছি;
তবু আমের গন্ধে সেই অনিন্দ্য মাছি
এই এতদিনে এল! যদিও তার আগে অসংখ্য
ভালবাসার নিঃশঙ্ক
হিসেব আছে। যেমন,—আরোগ্যর রোদ
ছুঁয়ে গেছে ছুঁয়ে যায় আমার আজন্ম দুঃখবোধ;
যেমন,—অগাধ বিশ্বাসে পথ পেরোতে মাঝামাঝি
জায়গায় দাঁড়িয়ে পা কেঁপে গেলে আমার পরিণামহীন কারসাজি
দেখে ত্রাণের সঙ্কেত পাঠায় কেউ। আমি অস্ফুটে বলে উঠি : ঈশ্বর! ঈশ্বর!
তবু এই নশ্বর
দেহ বাদ
সাধে; যেহেতু সে জানে কঠিন রোগের পর নিরুপম পথ্যের স্বাদ।
অজস্র কাজের ভিড়েও তাই হঠাৎ
মনে পড়ে— আমার প্রথম প্রেম মায়ের হলুদ-মাখা একমুঠো ভাত।

কবি বনাম কুবের

কবি বললেন— হবে।
তবে
একদিন আবছা সকালে ধরা দিয়েছিল যে পাখি,
তাকে ফাঁকি
দিও না। আর, ওই নিরাপোস কুকুরটাকে বশ
মানাও। তা হ'লে মিলতে পারে বিকেলের রোদের মতো অর্থ কিংবা যশ!

কুবের বললেন— শোন।
কোন
পাখি-টাখি পোষা
নিরর্থক। বরং কিছু ভেজাল অঙ্ক কষা
শেখো। কুকুরটাকে ছেড়ে দাও অহংকারী ভ্রমে—
দেখো, মানুষ পা দু'টো রাখে কেমন সম্ভ্রমে!

আমি ভাবি— ছাপোষা মানুষ।
এতকাল অর্থহীন ফানুস
উড়িয়েও পা রাখার মাটি
জুটল না! আমি তাই কবির বাগানের পথ বদলে কুবেরের গদির দিকে হাঁটি।

সব শিশু যীশু নয়

সব শিশু
যীশু
নয়। মাতৃস্তন্য
না হয় পণ্য
হয়েই থাক। সামনে আহার—
নাও থাকতে পারে। আড়ালে তো রয়েইছে সাদা দুধের কালো পাহাড়!
কাছাকাছি
আরও কত নাছোড়বান্দা মাছি
আছে। কাছে দূরে
ঘুরে ঘুরে
পাখি
চেনার আগেই ভেসে উঠবে সারিবদ্ধ ফাঁকি।
তবু নতুনতর চাপ
সৃষ্টি হবে উত্তরোত্তর উত্তাপ
ছড়াবার জন্যে। 'ভালবাসি' বলবে যে বরুণা
করুণা
নিয়ে তাকাবে সেও—নির্দোষ অক্ষমতাকে। ঝড়
উঠলে উড়ে আসা খড়
নিয়ে বাঁধা গৎ
মতো ঘর বানাতে গিয়ে আবিষ্কৃত হবে প্রতিবন্ধী ভবিষ্যৎ।
তা হ'লে দোষ
কার? যদি চোখের তারায় রোষ
জমা হয় মহত্তম চুরি
দেখতে দেখতে? যদি ঝল্‌সে ওঠে হাতে অমল ছুরি?
এত সব স্বার্থপর প্রমা
অর্জনের পরেও কি সে ক্ষমা
করতে পারবে—বেথলেহেমের শিশুর মতো? সব শিশু
তো আর যীশু
নয়।
তাই ভয় হয়।

দু'টি ফুলের গল্প

একই গাছের ভিন্ন দু'টি ফুল।

প্রথম ফুল বলল— আমার স্বপ্ন শুধু
নির্জন নিবেদন হয়ে ওঠা
দেবতার পা'য়।

দ্বিতীয় ফুল বলল— আমি চাই
উদ্বেল উপহার হতে
নারীর খোঁপায়।

একদিন সকালে এক মিতব্যয়ী পুরোহিত দ্বিতীয়
ফুলটিকে তুলে নিয়ে গেল।
একদিন বিকেলে এক বেহিসেবী প্রেমিক প্রথম
ফুলটিকে তুলে নিয়ে গেল।
এইভাবে কবিতা-গ্রস্ত হল গদ্যের ছায়ায়।

দূরত্ব

কোন বন্ধু তার দুঃখী ভালবাসার গল্প শোনালে
আমরা, অন্য বন্ধুরা
তা শুনতে শুনতে এখন পর্যায়ক্রমে বিবর্ণ হাই তুলি;
আমার ঠোঁটে অনিবার্য রাগ ফুটে উঠলে
সবাই
তার আঁচ পেতে পেতে ডুবে থাকে অসহ্য সহনশীলতায়;
কারও চোখে যদি ছায়া ফেলে সঙ্গত ঘৃণা
অন্যরা
তা দেখতে দেখতে গোপনে তৈরি হয় নির্বীজ সহবাসের জন্যে!
এ ভাবেই এক রেঁস্তোরার অভিন্ন টেবলে
আড্ডা দিতে দিতে
আমরা ভেতরে ভেতরে আলাদা টেবলে বসে
ভাবতে থাকি—
হিমগিরি এক্সপ্রেসের চেয়েও কোন দ্রুতগামী ট্রেনের কথা।

গোয়া : ১৯৮০

ভ্রূকুটি ছিল না কোন উগ্রপন্থী সন্দেহে,
বরং প্রসন্ন বিষাদ ছিল টেরেসা প্রসঙ্গে;
হাতে হাত রেখেছ স্বদেশী ভেবে—মনে আর দেহে
অচেনা ভয়-ভীতি গেছে সব—যা ছিল আমার সঙ্গে।

বিছিয়ে রেখেছ যত্নে স্বর্গের মতো নিসর্গ
ছুঁয়ে গেছে দোনা-পাওলের কিংবদন্তী হাওয়া,
এখানেই হতে পারে অন্যরকম উৎসর্গ
বারবার বলেছি তাই—এ যাওয়া তো নয় যাওয়া।

থাকতে পারে গোপন পকেটে প্রকাশ্য দারিদ্র্য
দুঃখ বা অভ্যাসে ছুঁলেই বা তরল-গরল;
হাতের মুঠোয় হাত ছিল—উষ্ণ এবং আর্দ্র,
বাঁকা চোখেও যেন মনে হল সব কিছু সরল।

বেলাভূমি ছুঁয়ে যাবে মান্দোভীজল [illegible] চ্ছলাৎচ্ছল
বিষণ্ণরোদ, প্রসন্ন মেঘ মানুষজনের মাঝে
কোলাহলময় তোমার ওই দুঃখী চোখের জল
ডাকবে নাকি মার্মাগাঁও বন্দরে, জাহাজে?

গণতন্ত্র

ও ভাবে তর্জনী তুলে কথা বলো না।
মনে রেখো—
তোমাকে এমন কিছু নিঃশর্ত আনুগত্য
আমরা দিইনি।

ও ভাবে রক্তচক্ষু দেখাও কাকে?
ভেবে দেখো—
তোমাকে এমন কী নিঃসীম সময়
আমরা দিয়েছি?

ও ভাবে তীক্ষ্ণ স্বরে কথা বলো না।
লক্ষ্য রেখো—
তোমাকে এমন কিছু নির্বাধ চাবিকাঠি
আমরা দিই নি।

তোমার মদ মাংস এবং মত্ততার
একটা সীমা থাকা উচিত।
ওহে পরান্নভোজী বাঘ!
ভুলে যাও কেন—

তুমি আসলে আমাদের তন্ত্রের মন্ত্রপূত মূষিক!

যুক্তি, সিদ্ধান্ত

আমরা প্রায়শ যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে
সিদ্ধান্ত নিই না;
বরং সিদ্ধান্তের মুখ চেয়ে
যুক্তিগুলিকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করি।

পছন্দমতো জিনিস কিনতে না পেরে বলি :
এই দামে এর চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না!
আমরা তখন হঠাৎ-ই সাধের কথা ভুলে
সাধ্যের কথা ভাবতে বসি।

সমুদ্র কিংবা পাহাড়ে গিয়েও ভাল না লাগলে
স্বগতোক্তি করি : নির্জনতা কী সুন্দর!
জনারণ্যের নিত্যতায় অভ্যস্ত এবং সুখী
আমরা তখন দারুণ রকম নির্জনতার উপাসক হয়ে যাই!

অথবা স্বপ্নের নারীর সঙ্গে শয্যার নারীর
প্রভেদ টের পেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করি—
নিজেকে জনান্তিকে পরামর্শ দিই : মেনে নাও।
মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়াই তো জীবন!

তাড়া

কে বা কারা
শুধু তাড়া
দিয়ে যাচ্ছে আজন্ম। শৈশবে, একা
খেলতে খেলতে আকাশে জলদর্চি রেখা
দেখে সভয়ে ডাকত কেউ : বাড়ি আয়! বাড়ি আয়! খেলা
ফেলে চলে এসেছি কতদিন—বেলা
ফুরোবার আগেই। কৈশোরে, অসময়ের মাঠে
পা বাড়ালেই মনে পড়ত—অপুর বাবা মারা যাচ্ছেন কাশীর
গঙ্গার ঘাটে।
বন্দী
ঘরে কেঁদে উঠত প্রতিবন্ধী
আবেগ; মনটা
মলিন হয়ে উঠত শেষ প্রশ্ন শেষ হবার আগেই ঘণ্টা
বেজে গেলে। যৌবনে, চারিদিকটা সামান্য গোছগাছ করতে
যাচ্ছি যেই—
সময় নেই, সময় নেই
করে ঝড়
উঠছে; অথচ হলুদ হয়ে আসছে গাছের পাতা, উড়ে যাচ্ছে খড়।
হাহাকার পরিব্যাপ্ত
হয়ে উঠতে চাইছে অসমাপ্ত
কাজের দিকে তাকিয়ে। ফুটে উঠছে কালঘাম
কিছু একটা করা অথবা হয়ে ওঠার চেষ্টায়। কিন্তু বিধি বাম—
বলতেই হয়। নয়তো চারদিক থেকে সেই ঘণ্টা এ হেন
বেপরোয়া বেজে যাবে কেন?
কে বা কারা
যে এমন তাড়া
দিয়ে যাচ্ছে—সর্বৈব;
আশৈশব!

কবিতা, কবিতা নয়

অনেক কিছু কবিতা বলেই
সব কিছু কবিতা নয়।

স্বজনের ভাঙাচোরা মুখ
সন্ন্যাসীর গোপন গুহা
গৃহীর বিধ্বস্ত কৃপণ চাঁদ
গণিকার নিরূপম নষ্টামি
এমন-কি, ইস্তাহারও কবিতা হতে পারে;
মিটিং মিছিলের মুষ্টিবদ্ধ হাত
খরা বন্যা মহামারীর মূর্ত মানবতা
এমন-কি, সংবাদ যে কোন, মূলত কাব্য হ'লেও
সভ্যতার মারণাস্ত্র কখনও কবিতা নয়।

সত্যের চেয়ে

সত্যের চেয়ে সম্ভাবনা আরও বেশি
সম্ভাবনাময়।
মানুষের জন্ম
সে তো ভয়ংকর আটপৌরে অথবা নিরূপাধি নির্যাতন
ছাড়া কিছু নয়;
ভ্রূণ সঞ্চারের সুখাবেশ যত্ন খুব বেশি নেই!

উৎসবের রাতগুলির
অমায়িক প্রবঞ্চনায় জুড়ি মেলা ভার;
অথচ তার আয়োজন কতো সম্ভাবনাময়!

ক্ষমতার অলিন্দে জমে-ওঠা
ঈর্ষার কাঁটা ষড়যন্ত্রের ভাঙা চোরা কাঁচ নষ্টামির এঁটো
মিছিলের শুদ্ধতার কাছেও ঘেঁষে না!

সম্ভাবনা শুধু সুন্দর
সত্যের চেয়ে।

ভাইজাগ '৮৪

মুষ্টিবদ্ধ হাত শিথিল হয়ে গেছে কবে;
জল ও পাথর পাশাপাশি ট্যুরিস্ট ডাকে এখনও।
সহিষ্ণুতা পড়ে আছে
এখানে ওখানে
গ্রামগঞ্জ শহর বন্দরে, ফেনিল প্রেক্ষাগৃহে;
চুট্টার ধোঁয়ায়, তরল গরলে দিন কেটে যায়।
অহংকার ভ্রূক্ষেপহীন
ক্রমাগত সীমানা ছাড়ায়
সভ্যতা কী মানুষকে দেওয়া মানুষের ঘুষ?

সহিষ্ণুতা ও অহংকার পাশাপাশি ট্যুরিস্ট ডাকে এখনও।
মাশুল উসুল তোলে
ডলফিন নোজ পয়েন্ট থেকে স্মিত বাইনোকুলার।
এত অহংকার কেন এই শতাব্দীতেও!
এত সহিষ্ণুতা খুব সম্মানের বুঝি!

সমুদ্র!
তোমার শিথিল হাত ফের মুষ্টিবদ্ধ হোক।

কবির বয়স, মৃত্যু ইত্যাদি

আমরা এতকাল তাঁর কবিতায় মগ্ন ছিলুম;
এবার কি তাঁর
আদ্যন্ত আত্মজীবনী প্রকাশের সময় হল!
আমরা তাঁর প্রতিকৃতিতে এঁকে দেব
বাষ্পের মতো চন্দন,
নশ্বর ধূপকাঠি জ্বেলে দেব
ছবির নীচে;
শতাব্দীর শোকের আয়ুর মতো
মালা দিয়ে সাজাব ছবির মানুষ।
অথচ একটু আগেও—
দগ্ধ চিতার ওপারে ঝুলে ছিল বিদগ্ধ চাঁদ;
সন্ধ্যের লোকাল ট্রেন
যথারীতি পৌঁছে দিয়ে গেছে শ্রমজীবী হাসি,
নিশুতি রেললাইন থেকে ফিরে গেছে
নিঃসঙ্গ যুবতী;
তাঁর কবিতার অবর্ণনীয় বর্ণনার মতো!
তাহ'লে আর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তুলে নেব কেন—
সময় যাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে নি,
মৃত্যু যাঁর অবাধ্য ভৃত্যের মতো কাছেও ঘেঁষে না!

ভারসাম্যের গান

এইমাত্র ফিরে গেছে পৃথিবীর শেষ দু'টি মদ্যপ পা;
বাসনার হিমজল এখনও ঘাসের শরীরে—
আসঙ্গের বালিশেরা এইবার নিঃসঙ্গ হবে;
বিনিদ্র বাতিস্তম্ভের আলোরা ঘুমোতে যাবার আগে
দেখে যাবে নিঃস্ব কলকে ফুলের অম্লান শুয়ে থাকা।
প্রায়ান্ধ পর্দার ওপার থেকে কে ছড়াবে নিবিড় আবীর
দিক্ বদলের বাতাসের দেহে, অলৌকিক মিশে যাবে
রেণুতে বেণুতে; আরোগ্যের মোরগের পরিচিত স্বরে
দূরের আজান। গৃহী সাধকের সংকীর্তনের দোঁহার
ভোরের বাতাসে এখন অন্য এক সাম্যের গান।

অভ্যেস

চেনা অন্ধকার আর অনালোকিত আলোয়
ঘুমন্ত নারীর মতো মায়াবী দেখায়;
ঝিঁ ঝিঁ ছাড়াবার জন্যে পা মেললেই—
নড়ে ওঠে পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো শেকড়।

নিপুণ বলিরেখা স্মিত লাবণ্য একই সঙ্গে
জাগিয়ে দেয় বিশুদ্ধ বিভ্রম;
ক্লান্ত খানাখন্দে পা ফেলতে ফেলতে—
অকস্মাৎ মুখে এসে পড়ে উৎসবের আলো।

জর্জর দেহমন দেশান্তরী হতে চায়—
পাথরের চোখে এত জল কেন?
নিমেষে ফুটে ওঠে উদ্ভিন্ন স্বদেশ—জলছবির মতো;
আকণ্ঠ দুঃখ নিয়ে নির্লিপ্ত শুয়ে থাকে এত পিছুটান!

সূর্যোদয় : কন্যাকুমারী '৮৭

সূর্যাস্ত দেখিনি তেমন ক'রে;
সে তো শুধু ক্লান্ত ঘরে ফেরার গান।
দগ্ধ কিছু স্মৃতি, প্রতিবন্ধী সত্তা আর নিরঙ্কুর ভবিষ্যৎ নিয়ে গেছি
সমুদ্রের মতো
বিদগ্ধ হৃদয়ের কাছে;
মেধাও উদ্ভিন্ন যুবা, বলিরেখাহীন।
প্রজ্ঞাবান প্রকৃতিকে নির্মাণ করেছে মানুষ;
ইতিহাস পুরাণের প্রাসঙ্গিকতার
বর্তমান কাছেও ঘেঁষে না!
নীল জলরঙের ওপর
তারুণ্যের গেরুয়া আগুন এখানেই মানায়।

সূর্যোদয় মানে তো এই সব;
জন্মের ভেতরে লুকোনো জন্মান্তর।

পর্দা, দেয়ালের বিরুদ্ধে

অনাবিল গোপনকে প্রকাশ্যে না আনো যদি—
ক্ষতি নেই;
কিন্তু পর্দার অহঙ্কার কেন—
জানো না
ও ভাবে কৌতূহলী আলো শুধু অন্ধকার ছড়ায়?
মুখর ইতিহাসও মূক হয়ে যায়!

নশ্বর অধিকারকে যদি চিরায়ত ভাবো—
লাভ নেই,
তা' বলে দেয়ালের দাম্ভিকতা কেন—
জানো না
ও ভাবে ছিন্নমূল ছায়া শুধু রোদ্দুর প্রসারিত করে?
জীবন্ত ভূগোলও প্রতিবন্ধী নিঃশ্বাস ফেলে!

এসো—
আমরা তাই পর্দা এবং দেয়ালের বিরুদ্ধে
পর্দা আর দেয়ালেই লিখে রাখি স্বতঃস্ফূর্ত শ্লোগান
অদূর প্রজন্মের জন্যে!

স্মৃতি, অনুষঙ্গ

স্মৃতির শব্দের জন্যে
আমার সমুদয় শ্রুতি উৎকর্ণ হয়ে থাকে;

অনুষঙ্গের সঙ্গ
আমার অবসরের প্রিয় প্রসঙ্গ—বরাবর;

সমুদ্র নয়
তার বিশালত্বের আভাসই আমাকে চমকে দেয়!

পর্বতমালা নয়
তাকে ঘিরে থাকা রহস্যের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারিনা!

প্রিয় নারী আলো জ্বেলে দেয় ঠিকই
চুড়ির শব্দ, শাড়ির খস্‌খস্‌ ক্রমাগত উসকে দেয় সেই আলো!

শুধু জীবনপঞ্জী নয়
স্মৃতি ও অনুষঙ্গের কাছেই আমার ঋণ বেশি।

ছায়া

কারও কারও ছায়া ফোটে আশ্চর্য নিটোল
ক্রমশ তা দীর্ঘ হয়;
ফুটে থাকে ছবির মানুষ—দেয়ালে দেয়ালে
প্রয়াণও বশ্যতা মেনে নেয়
প্রয়াণের কাছে!

ভুল ছায়া পড়ে থাকে কারও কারও
পায়ের কাছে—আজীবন;
স্বজনের ছবি হয় হয়তো বা কেউ
সব দাগ মুছে যায়
মর্কটের গেরস্থালি বলিরেখা জালে!

নির্মাণের স্বেদ ও সম্ভ্রম মিথ্যেই ঝ'রে যায়—
কারও কারও ছায়াই পড়ে না;
কালবেলা বয়ে যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
ওড়ে শুধু, উড়ে যায় ধূ ধূ
অস্তিত্বহীন ছাই!

শোক

খণ্ড মেঘের মতো নয়—
দুরারোগ্য বৃষ্টিপাতের মতো
ক'ফোঁটা কবোষ্ণ অশ্রুর মতো নয়—
প্রবল তুষার ঝড়ের মতো
নেমে এসো।

শুধু বিদায়ক্ষণে
রুমাল ওড়ানোর বাষ্প নয়,
ভিড় বাসে পা মাড়িয়ে যাবার ধোঁয়া নয়;
আরও কিছু গভীর, প্রাণবন্ত বিষাদের মতো
নেমে এসো।

দেখে নিই—
নিজেকে কতখানি নির্মাণ করেছি
পাথরে-পাথারে!

তোমাকে

হেঁটে যাচ্ছিলে একা, একান্ত রোদে
অন্ধকার বেজে ওঠে ওই সেতার-সরোদে;

জনারণ্যের হরিণী বুঝি, অকুতোভয়
নির্বাক-প্রতিমা আমার অনিমেষ-বাঙ্ময়;

যানজট মেনেছে হার, চাহনি অচঞ্চল
নৈঃশব্দের ঘামে জেগে থাকে কোলাহল;

অনাঘ্রাতা হে, এখনও ছোঁয়া হয়নি তোমাকে
আঙুলে জড়াব আঙুল মিশে যাও যত দুরূহ বাঁকে!

যাও পাখি

যা রে পাখি, উড়ে যা—
শিমূল পলাশ, ফাগুন না!

ফন্দিফিকির সারাক্ষণ—
মনের মধ্যে কোথায় মন?
ফাগুন এখন আদিম বন!

ফাগুন যেন কিসের লালা—
মালা নয় রে, বিষের জ্বালা!
পুড়ে মরছে বঙ্গবালা!

আগুন এখন ফাগুন নয়—
খুনীর চক্ষু দেখায় ভয়!
কাদের চোখের জল শুকোয়?

পুড়ছে আগুন, পুড়ছে ফাগুন—
সাবধান হো, রাত্রি জাগুন!

সমুদ্র-স্নান

সমুদ্র স্নানে এসে মিলেছে
সমুদ্র।
ধুয়ে যাবে কলুষ
পূর্ণ হবে কলস?
জ্বলে উঠেছে ধুনুচি কঠিন কোমল
আত্মার মতো।
দূর থেকে শোনা যাচ্ছে
ধ্রুপদাঙ্গের কোলাহল।
শব্দ তরঙ্গে ভেসে আসছে রামধুন...
উই শ্যাল ওভারকাম...
হেঁটে যাচ্ছে একাকী ও যূথবদ্ধ মানুষ;
সামান্য হ'লেও কি কেঁপে উঠছে সন্ন্যাসীর গার্হস্থ্য—
প্রজ্বলিত শিখার মতো?
তাপাঙ্ক মেনেছে হার—মানসাঙ্কের কাছে।
সমুদ্র স্নানে এসে মিলেছে
সমুদ্র।
হেঁটে যাচ্ছে—
হারিয়ে যাচ্ছে—
খুঁজে যাচ্ছে একাকী ও যূথবদ্ধ মানুষ;
আত্মার কাছে ভেসে আসছে
নতজানু আর্তনাদ : এ লখিয়া কী মাঈ, জলদি আ যা...
হাম তেরে লিয়ে হায়রান হ্যায়...
শব্দ তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে রামধুন...
উই শ্যাল ওভারকাম...
এ লখিয়া কী মাঈ...
এই ধূসর সকালে
এই গভীর আলোকিত অন্ধকারে...
সাগর বেলায়...সাগর মেলায়...
ভারতবর্ষ খুঁজে মরছে
অখণ্ড ভারতবর্ষকে।

ক্লান্তির কবিতা, অক্লান্ত

যেখানে এখন বাস—
ব্যথার মতো পলাশ
ফোটে, কাল মধুমাস
        বিষাদে আছি রে, ভাই!

নদীতে গতির চর
নীলিমাও দুশ্চর
জানি না কি অতঃপর—
        ভাবছি, কোথায় যাই!

মানুষ চিনেছি রণে
মানুষ চিনেছি বনে
মানুষ চিনেছি মনে?
        অক্লান্ত আছি, তাই!

স্বার্থ

কী তীব্র কটুগন্ধময়!
তবু অনায়াস দক্ষতায় জড়িয়ে রেখেছে—
সম্পর্কসমূহ—গভীর আঠার মতো!

দৃশ্যতঃ দৃশ্য নয় কিছুই,
শুধু প্রথম আলোর মতো নিরাবেগ চোখে
ধরা পড়ে—মর্কটের গেরস্থালি জাল!

নিরপেক্ষ বাতাসের মতো কে বলে দেবে—
হিংস্রতার মতো মায়ায়
ঘৃণার মতো প্রেমে
বাসনার মতো বৈরাগ্যেও
নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই!
সঙ্গমেও উপ্ত হয় কিসের বীজ?

তবু আছি
ঘিরে আছে অজস্র দ্বন্দ্ব তন্তুজাল!
প্রত্যাশী হাতের হাওয়ার প্রত্যাশায়
নিরর্থক জেনেও
পরমার্থ ভেবে নিয়ে
ঝুঁকে আছি—নির্ভুল, নিরাপদ!

আগুন জানে

সকাল এখন সকাল নয়—
পাতায় জ্বলে অবক্ষয়;
ভোরের চোখে স্বপ্ন নয়
পাখির ডানায় কিসের ভয়!

দুপুর এখন নয় দুপুর—
খুঁজে দ্যাখো অন্তঃপুর;
ঘুঘুর ডাকে কই বিষাদ
কিশোর চোখে শুধু প্রমাদ!

বিকেল এখন বিকেল নয়—
বিকেল মানে উৎসব নয়;
দু'জোড়া চোখ অঙ্ক কষে
প্রহর পেরোয় শুয়ে বসে!

আত্মচরিত কার বা আছে?
লয় নাচে না প্রলয় নাচে!
আগুন জানে কালের ব্যথা—
আগুন জানে এসব কথা!

কথা

সকলেরই কিছু-না-কিছু বলার কথা থাকে;
শুধু আমারই কিছু বলার নেই!

কিছু কথা প্রকাশ্যে থাকে
কিছু কথা সঙ্গোপনে
অনেকেই বড় হইচই ক'রে বলে
অনেকে একেবারে নিঃশব্দে
কেউ কেউ মুখে বলে
চোখেও বলে কেউ কেউ
অনেকে গদ্যে বলে
অনেকে পদ্যেও বলে
কারও কারও কথা মূর্ত হয়ে ওঠে
বিমূর্তও থাকে কিছু কথা...

যে ভাবেই হোক—
সকলেরই কিছু-না-কিছু বলার কথা থাকে;
শুধু আমারই কিছু বলার নেই!

আমি শুধু শুনি, শুনে যাই—
কত কথা;
কত ঢঙের, কত রঙের...
শাদা কথা
কালো কথা
লাল কথা
নীল কথা
হলুদ কথা
সবুজ কথা
আবার বিবর্ণ কথাও!

সারা দিনরাত শুধু শুনি—
শুনে যাই।

শুনতে শুনতে...
শুনতে শুনতে...
একেক সময় মনে হয়,
এত কথা, এত শব্দ, এত গরল...
আমি না নীলকণ্ঠ হয়ে যাই!

কিংবা কে জানে—
এভাবে শুনতে শুনতে
কোনদিন
আমার না-বলা কথাও বলা হয়ে যাবে কিনা!

ভিড়

আজন্মের চেনা নয়
ইদানীং চিনেছি অস্থিমজ্জায়।

বিংশ শতাব্দী!
শেষ দশকের সিঁড়ি ও শুঁড়িখানায় এত মানুষ!
প্রেমিকের স্মিত হাসি
কসাই আর বধ্য পশুর উল্লাস
মিশে যায় ময়দানের বাতাসে!
এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়ে যায়
স্বপ্ন ও প্রবঞ্চনা!
রক্তদান শিবিরে নাম লিখিয়েও
যারা ফিরে গেল—
মুহূর্তেই মিলিয়ে যায় রাজপথে
রেঁস্তোরায় টেবল-না পাওয়া মানুষের সাথে!
সতর্কতাকে তর্জনী দেখিয়ে
বিপজ্জনক ছুটে যায় যত যান
তার চেয়েও বেশি মানুষ আতঙ্কে ছিটকে পড়ে ফুটপাতে!
এই মাত্র বিশাল মিছিল পথ পেরুলো—
ঠিক উল্টোদিকেও তখন জনস্রোত!
দিনের প্রথম ট্রামে বায়ুবিলাসী মানুষ
আর রাত জাগানিয়া নারী পৌঁছে যায়
যে যার গন্তব্যে!

কেউ নিঃসঙ্গ নয়;
শুধু সম্ভ্রমহীন সংখ্যা।

এই অসংখ্য সংখ্যার আমি একজন।
এই সশঙ্ক সংখ্যার আমি কেউ না!

যম

বর্ণে গন্ধে ছিলে নিশ্চিত, তবু বর্ণচোরা
দৃষ্টি আমারও দিগ্বিদিকে, অশ্বমেধের ঘোড়া!

দেখতে দেখতে দিন গেল দ্রুত অতি
ভুল না ঠিক, ঘরে এল দুঃখের প্রজাপতি!

হাতে হাত রেখে কেঁপেছি প্রথম থরথর
বিষে বিষক্ষয় হল না—শুধু বিষজর্জর!

কোথায় ফেরাব চোখ? কিলবিল ক'রে পাপ
ভুলিয়ে দাও হে মন, ভোলাও মনস্তাপ!

খরা না বন্যা—কে যে বেশি কিংবা কম
হৃদয় জেনেছে শুধু তুমিই পাপের যম!

দাগ কাটা শিশি

দাগ কাটা শিশি
প্রহর কাটে, দিনও যায় রে, নিশি!

শিয়রে শমন নাকি
জেগে থাকে কে—দু'জনেই একাকী!

শীতের পাতা, নিদাঘের দাহ
শিরায় জুড়েছে কে—এমন অনন্ত প্রবাহ!

ও রে সুধাক্ষরা
মৌ-বনে যৌবন কাঁপে, স্বয়ং আত্মহরা!

ও দুর্বিষহ মায়া
নিবিড় যুগল ছায়ার পাশে ব্যস্ত বিষাদ কায়া!

সখা হে, সর্বনাশ
ভুলেছি অসুখ, কী সুখের পরবাস!

দুঃখের স্বদেশ ভূমি
হে অতুলনা, তোমার তুলনা তুমি!

আছি রণে, বিস্ফোরণে

সন্ধ্যাতারা ফুটল সবে—
আগুন শাড়ি কী নির্মোকে;
ধ্বস্ত দেহ, রিকশা ফেরে
কুকুর কাঁদে কিসের শোকে!

মধ্যযামের ইস্টিশানে
নিঃস্ব নারীর কী আর ভয়;
চোখের আলোয় আঁধার নাচে
রক্ষী দেবে কোন্ আশ্রয়!

রাতের কালো সাদার আগে—
নিভল বাতি চিলেকোঠার;
ভয়ের বুকে সাহস কাঁপে
ভয় কী শুধু সূর্য ওঠার?

আঁচ পেয়ে কার কী মনে হয়—
কোথায় আছি, সঙ্গোপনে?
সাদায় আছি, কালোয় আছি
আছি রণে, বিস্ফোরণে!

ও চাতক

ও চাতক ডাকিস কেন—
জল, দে জল!
খাতক মন বুক চাপড়ায়—
কর্মফল
ঘোর বন্যায় ঘর ভেসেছে
কি সম্বল
ক্ষেত ডুবেছে শূন্য খামার
নেই ফসল
বৃষ্টি এল বন্যা গেল
চোখের জল
আষাঢ় কেন আশার নয়
পাখি বল!
বুকের আশা চোখের ভাষা
জলবন্দী
আবেগ এমন নিঃস্ব যেন
প্রতিবন্ধী
জল জ্বেলেছে ক্ষুধার আগুন
বিষম অতি
চুল ছড়ানো কূল ছাপানো
কংসাবতী
স্বপ্ন কেন পশুর শব
পাখি বল!
সব ডুবেছে ভীষণ জেগে
ফলিডল
ভেতর ঘরে বাস ক'রে যে
কী এক ত্রাস
ও রে চাতক, তবু ডাকিস
সর্বনাশ
শ্মশান শুধু আগুন নয়
শ্মশান জল
শপ্ত পাখি, তবু ডাকিস—
জল, দে জল!

কোকিল ডাকে

জনারণ্যে স্টেশনের মুখে
'রেলে চাকরী, পি. এস. সি. ডাকে',
বেপরোয়া স্বর, সাহসী বুকে
হকার বন্ধু বিষম হাঁকে!

আপিস পাড়ায় খবর জোর—
ডাক দিয়েছে কাদের দ্বারী,
চাই ভি. আর. এস. চাকরীখোর
আয় ভি. আর. এস., আয় বাড়ি!

সিপাইশালার পাশে ঝুপড়ি—
আগুন জ্বলে রাত্রিদিন;
রাত দুপুর ডাকে—ওঠ, ছুকরি
আজ আর নয় খাদ্যহীন!

কিসের আশায় ঝলসে ওঠে—
লোভের ছুরি কিশোর হাতে;
ক' জোড়া অনাথকুসুম ফোটে
উলুশাঁখের সন্ধ্যারাতে!

হাত ও থাবার কী সহবাস!
বন্ধ মিলের চিমনির ছাই
উড়ে যায়; কমিউনের পাশ
কাটিয়ে পথ খুঁজছে শ্রমিক ভাই!

কাব্য নিয়ে ভাবব কখন;
শাক দিয়ে মাছ কে আর ঢাকে—
দ্বন্দ্বেছন্দে বন-উপবন
কাঁপে, কালবেলায়ও কোকিল ডাকে!

বাবার বন্ধুরা

বাবা নেই—
তাঁর বন্ধুরা আছেন আর বাগানে
নিজ হাতে-লাগানো কিছু দূষণঘ্ন গাছ,
তোরঙ্গে সুনিপুণ রিপু-করা অমলিন শাল।

অথচ পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে অবিকল আগের মতো
মাতৃগর্ভের কাছে ভ্রূণের ঋণ
কালো রাস্তায় সাদা খৈ উড়ে যায় একই রকম;
কিছু স্মৃতি, কিছু অপমান
উদ্বেলিত রেখে দেয় এখনও—
যেন স্থির জলের ক্যানভাসে বৃষ্টির রঙ!

বাবা নেই—
তাঁর বন্ধুরা আছেন আর কোথাও
কিছু বৎসল বাতাস
অন্তরঙ্গ গভীরে উষর উষ্ণতা কিছু বা।

শতাব্দীর জন্ম

আরও একটি রাত্রিশেষের ভোর?
নাকি—
ঘুমের গভীরে অচেতন পাশ ফেরা?

তা হ'লে—
এত জন্মের ভিড়েও
আরও একটি জন্ম
অজস্র নিরূপাধি নির্যাতন কেন?

নবীন শতাব্দী!
রেঁস্তোরা-বালকের বর্ণমালা চেনা আজও হল না!
গেরস্থ বাড়ির কাজের মেয়েটি
অকাজের খুকু হবে কবে?
যুবক চোখের আকাশে অহোরাত্রি ভেসে যায় হীনমন্যতার মেঘ;
বিপদসীমা ছুঁয়ে যায় যখন তখন যুবতী নদীর জল
দিনান্তের মুমূর্ষু আলোয় বৃদ্ধাশ্রমের ঠিকানা লেখা
শীর্ণ দু'টি হাত কতদূর যাবে?
মানুষের বাসযোগ্য মনোযোগ
মানুষের কোন লক্ষ্যভেদী খেলা!
চোদ্দ খণ্ডের অখণ্ড ইতিহাস অনেক বলেছে—
মুখর অতীত
স্তব্ধ হোক এবার!
'ফ্যান দাও গো, মা' কোরাসের চেয়ে মিছিলের গান
ফের জনপ্রিয় হোক!
একটি বোমারু বিমানও নয়—
মাথার ওপরের আকাশ প্রহরায় থাক অযুত শ্বেত কপোতের দল।
নবীন শতাব্দী!
নির্বাচন নয় শুধু
আরও কিছু নির্বাসন চাই!

বৃষ্টি আসবে

আকাশ যেন ইস্পাতের ফলা
চরাচরে দহনের ষোলকলা
        বীজতলার স্বপ্ন বুকে
        সুখে নাকি অসুখে
                চোখ চাটছে চাষী ও চাতক;

মাটির শরীরে বলিরেখা
চাষী ও চাতক নয় একা
        গাছের সবুজে হলুদের বাসা
        নৈঃশব্দ ছুঁয়েছে নীরব ভাষা
                'ঘর ও বাহির ভরেছে পাতক!'

তুমি নয়, আয়না সেজেছে রূপসী সাজে
লাস্যও আজ নেমেছে কাজে
        এবং কোথাও জমেছে মেঘ
        হলুদ পাতায় মৌন আবেগ
                স্বেদবিন্দুরা রুদ্ধশ্বাস ছাড়ে!

অনেক দৃশ্য, পট একটাই
চাই জল, জল চাই
        কোথাও বন্দী হয়েছে বাতাস
        কান পেতে শোন পূর্বাভাস
                সৃষ্টির কাজে বৃষ্টি না এসে পারে!

প্রতিহত কান্না

পাখি সব করে রব
হারিয়েছে শৈশব
ঠাকুমার কথকতা
আজ শুধু রূপকথা।
ধানক্ষেত রেলগাড়ি
ধারাস্নান, জ্বর ভারি
লেবুপাতা, করমচা
আয় বৃষ্টি, ধরে যা—
এ কালের শৈশব
হারিয়েছে ওই সব।
বই রঙ-পেনসিল
জর্জর বিষনীল
ঝড় জলে আম আর
কুড়োবে না, দায় ভার;
হার মানা, অভিমান
চল নেই, অভিযান
খেলা নয়, বন্দী
নয় সখা, দ্বন্দ্বী
জলছবি, জলতল
জয়, নয় ফলিডল
কাছাকাছি কেউ নেই
বাবা ওই, মা এই!
আম আঁটি, ভেঁপু বাঁশি
আরও দূর পিসীমাসী
কার চোখে স্বপ্ন
কে দিয়েছে জন্ম
প্রিয় শখ, অ্যালবাম
কার জোটে, কার বাম
স্কুল পথে কুহু স্বর
হারিয়েছে কৈশোর
কত আর, আর না
প্রতিহত কান্না!

একাল সেকালের কবিতা

তুমি ছিলে বেতসলতা
এখন বনস্পতি;
অলীক নয় রূপকথা
পতি পরম গতি!

তোমার ছিল মিছিলে পা—
ছদ্মবেশী দ্রোহ;
দে ধুইয়ে গরুর গা
অচ্ছুত বিগ্রহ!

আমিও নেই মুগ্ধ স্তাবক—
চোরাস্রোতের টান;
অগ্নিভুক স্বয়ং পাবক
জীবনমুখি গান!

সত্যদূষণ

যদি কেউ সব সত্যি বলে—
অগ্নিবর্ষণ শুরু করে দিনের প্রথম আলো
পাখিদের গান শোনায় হিংস্র গর্জনের মতো
গোলাপকে শুধোতে হয়, তুমি কী গোলাপ?

যদি কেউ সব সত্যি বলে—
অমৃত নয়, ভালবাসার ওষ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে বিষ
মায়াকাননের ফুলেরা বলাবলি করে গতরাতের পাপের কথা
জ্বরতপ্ত ললাটে কে হাত রাখল, তুমি কী জননী?

যদি কেউ সব সত্যি বলে—
নীল আলোকিত ঘরে হাত ও থাবার করমর্দন সম্পন্ন হ'ল
নগরনটী যেন লজ্জা পায় রাজদর্শনে
কোন উত্তরাধিকারই আমার প্রাপ্য নয়, হে পিতামহ?

যে কথা বলা হয় না

কখনও অতর্কিতে অনিন্দ্যসুন্দর মুখ দেখা হ'ল—
ইচ্ছে হয়, নতজানু হয়ে বলি, কী সুন্দর
—বলা হয় না।

মাঝে মাঝে আপিসের বড় সাহেবকে বলতে ইচ্ছে হয়—
—আপনার বাড়াবাড়ি রকমের কড়াকড়ি যদি একটু ......
—বলা হয় না।

সুকুমারের বউটাকে প্রায়ই ভাবি, বলব—
—সুকুটা একটা জানোয়ার, তোমার জন্য ......
—বলা হয় না।

দু'বেলা যাতায়াতের পথে পোড়া নেপালের সঙ্গে দেখা—
মুখ ফিরিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, কী পেয়েছিস তোরা ......
—বলা হয় না।

কখনও সখনও ঝোলা ব্যাগ কাঁধে ক্ষিতীশদাকে দেখি—
ভাবি, চিৎকার করে বলি, এই জন্যেই কি আপনাদের ......
—বলা হয় না।

অনেক সময় ভাবি—
এই যে বলা না-হওয়া কথা
প্রায় নিবে আসা ফুলকি
কখনও কি দাউদাউ জ্বলে উঠে
পুড়িয়ে ছাই করে দেবে না সবকিছু
অথবা আমাকে!

কবির জন্মদিন

(২০ শে নভেম্বর, কবি অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর ন্মদিন উপলক্ষ্যে)

আজ কবির জন্মদিন—
একটি হলুদ পাতা কি
        খসে পড়ল কোথাও?
তকতকে নীল ক্যানভাসে কে এঁকে রেখেছে
        এক টুকরো মলিন মেঘের মানচিত্র?
মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্যেও ফুটেছিল
        অবাঙমনসগোচর আলো
পঁচানব্বইয়ের চব্বিশে অক্টোবরের মতো?
এ সবের আলাদা কোন তাৎপর্য আছে?
কেন না, ক'দিন আগেই
ভ্রমরের মতো কবির কাছেও খবর এসেছে
তুমুল ফুটে ওঠার অপেক্ষায় কি ভাবে
        দিন গুনছে শিমূল!
অলস দুপুর জুড়ে বিমোহন দেখা হল—
চড়ুই দম্পতির কুশলী নির্মাণ!
যেন বহুকাল পরে ফিরে দেখা
শরণার্থী শিবিরের স্মৃতিজীবী বালক কোন!
বয়সে সামান্য বড় কিশোরীর চুমু
        কিভাবে রাতারাতি সাবালক করে!
গিরিশৃঙ্গ নয়, সাঁতরে সাগর পেরনো প্রতিবন্ধী যুবা
                        ফিরেছে শহরে।

প্রিয় প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা
        যুবতীর কানে
আর্ত প্রৌঢ়ের ভাষা
        কবি কি জানে না?
জন্মান্তরের ইতিহাস নয়—
এক জন্মেই অসংখ্য জন্ম, অজস্র জীবন
        বারবার ভূমিষ্ঠ হয়!

কে জানে—
হয়তো কাল অথবা
        পরশু কিংবা তার পরদিন
        উদ্ভিন্ন ফুটবে ফুল কিংবা কবি স্বয়ং
                        কবির বাগানে!

শর্বরী সব জানে

মেঘের হাসি না রোদের আভাস, কে বেশি চোখ টানে
অল্প স্বল্প বাতাস বইছে—গন্ধ বয়ে আনে
গন্ধ কিসের? ভাববে যে কেউ, এসব কথার মানে—
শর্বরী সব জানে!

হা হা করে হাসছে দূষণ, জামার বোতাম খোলা
নষ্ট নারী চোখ মটকায়—প্রেমিক আত্মভোলা
প্রেম কী আবার! এতদিন পর এসব কথার মানে—
শর্বরী সব জানে!

জল নড়ছে না পারের মানুষ, একটুও নেই ছায়া
মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে উঁকি মারছে মায়া
কিসের মায়া! মায়াকে কেউ জানে—
শর্বরী সব জানে!

তবু মানুষ—হলুদ মানুষ হাঁটছে সরলরেখায়
রাতদুপুরে মানুষকে ঠিক নিজের মতো দেখায়
সত্যিকারের মানুষ! শতক শেষে এসব কথার মানে—
শর্বরী সব জানে!

গানের দু'রকম

।। ১ ।।

স্বনামধন্য গান গাইছেন—
পৃষ্ঠপোষণ কার?
ঠোঁটের কোণে সব পৌরুষ
নিখুঁত ভঙ্গিমার!
সব্যসাচীর গানবাজনা
বিত্তবাসের যম
তাল ঠুকছে সচ্ছলতা
অক্ষত সম্ভ্রম!

।। ২ ।।

রেলের কামরায় রামপ্রসাদ
পরজীবীর স্বরে
শরীর জুড়ে কিসের দাহ
জল পড়ছে ঘরে!
মৃৎকলসে বোল ফুটছে
কী থেকে কী হয়
ছুঁয়ে যাচ্ছে আমজনতা
ছুঁয়ে যাচ্ছে হৃদয়!

বিজ্ঞাপনের মতো

মেয়ে যাচ্ছে ইস্কুলে
ছেলে উড়ছে ফুলে;
মুঠোয় কারও টুকরো চাঁদ
স্বপ্ন না বিতত ফাঁদ?
দৃশ্যগুলি সহজ নয়
মনে হচ্ছে যত
ঠিকঠাক বললে হয়
বিজ্ঞাপনের মতো!

কারও মুখে সফলতা
মনে হচ্ছে রূপকথা
ফুল ঝরছে, ঝরছে না স্বেদ
দুঃখ কার? নেই সংবেদ!
দৃশ্যগুলি দুর্জ্ঞেয়
সন্দেহ নেই তত
তাই বলে কী একটু হেয়
বিজ্ঞাপনের মতো!

ঘরবাড়ি নয়, এ কোন দেশ
পোকামাকড় সব নিঃশেষ,
মানুষ কোথায় সংগোপনে
ধর্মে আছে, আছে রণে!
দৃশ্যগুলি সহজ নয়
মনে হচ্ছে যত
সত্যি কথা বললে হয়
বিজ্ঞাপনের মতো!

বালক জানে

বালক কিন্তু অনেক জানে
বাল্যকাল ছাড়া
ভোরের আলো এখন প্রবীণ
কৌতূহল হারা!
পাখির সঙ্গে কথাবার্তা
কে শেখাবে তাকে?
একটুও নেই সময় কারও
অযাচিত বাঁকে!
ইস্কুলে যায়, ফিরে আসে
প্রতিদ্বন্দ্বী ইঁদুর
ঘ্রাণে লাগছে পাকা ফসল
বৃষ্টি এখন বিধুর!
বাতাস ভারী ভাল শেখায়
সময় বা কম কিসে
প্রশ্নবিহীন সব উত্তর
ঘুণ লেগেছে শীষে!
অচেনারও বুক কেঁপে যায়
কী থেকে কী হয়
সব অজানা নখের ডগায়
বিপন্ন বিস্ময়!
ভোরের আলো এমন প্রবীণ
দ্বিপ্রহরে তারা
বালক কিন্তু অনেক জানে
বাল্যকাল ছাড়া!

রোটাং পাস, ১৫ই অক্টোবর, '৯৮

লঘু পায়ে হেটে যাচ্ছে মেঘবতীরা
ছন্দে ফুটে উঠছে নৃত্যের বিভঙ্গ
বয়সের গাছপাথরহীন
        প্রাজ্ঞ পাথরপুরুষের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই!
মেঘবতীরা তুমুল কিশোরীর মতো
        হতাশা জানে না!
বাতাসের আবহসঙ্গীতের তালে
ছন্দের ঢেউ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে
        ঘিরে ফেলে
তুষারজটা ধ্যানমগ্ন পুরুষপ্রবর!
কার ধ্যানে নিমীলিত বসে আছে
        দুর্জয় পুরুষ?
অমরত্বের এই বাসনা পার্থিব নয়?
দু'চোখ জুড়ে আসে মুগ্ধতা
        ঘুমের মতো।
পাথরের ধ্যান কি সম্মোহন ছুঁড়ে দেয়
বাতাস ও মোহিনী মেঘের দিকে?
পরাভবের সাক্ষীকে সহ্য করে না
        হাড়হিম বাতাস!
নীচে নেমে টের পাই
        কারা যেন বিক্রী করে পৌরুষবর্দ্ধক!
বিরক্তির ধোঁয়া ছেড়ে পাশ কাটিয়ে
        গাড়িতে এসে বসি। আয়নায় চোখ রেখে
        চমকে উঠি—অজেয় পাথরতুষার কখন
আমাকেও প্রাজ্ঞতার স্ববেশ দিয়েছে!
মেঘ ও বাতাস কেউই জানে না!

সেমিনার : গ্রীষ্ম বিষয়ক

শিল্পপতি বললেন—
আত্মরক্ষার কথা;
ছাতার জন্মবৃত্তান্ত
এমনকি, আজীবন কোন না কোন ছাতার নীচে
থাকার কথাও!
শ্রমিক নেতার মতে—
পৃথিবীতে উত্তাপ বাড়ছে কেবল;
দৃষ্টিতে মায়াবী আলো জ্বেলে
নিজেকে আড়াল করার কথা
বললেন—রোদচশমায়!

চিত্রতারকা মুখ খুললেন—
দেশী-বিদেশী পানীয় প্রসঙ্গে;
কেননা, সম্ভারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও
চারপাশে তৃষ্ণাও পাল্লা দিচ্ছে
সমান তালে!

কবি শোনালেন—
ফুল ও প্রসাধনের ইতিবৃত্ত;
গন্ধের কামনাবাসনা
এমনকি, গন্ধ কি ভাবে ঢেকে দেয়
আরও কত গন্ধকে—তাও!

শুধু প্রবেশাধিকার পায়নি বলে—
বাইরে অভিমানে ফুঁসছিল সময়;
প্রেক্ষাগৃহের বাইরে আসতেই
তীব্র সঙ্গসুখে আক্রান্ত হলেন শ্রোতা!

মোহিনী, ভাল থেকো

চোদ্দ বছর আগে এক সন্ধ্যায়
আগুন জ্বেলেছিলে
চোদ্দ বছর আগে তুমি থাকতে
ছন্দ এবং মিলে!
মিলের আশায় লিখেছিলুম
কিছু নাটক, পদ্য
পদ্য হয়নি নাটক হলেও
ছন্দ—সে কী ছদ্ম!
বসন্ত হায়, ডেকেছিলে
তরল আমন্ত্রণে
পাতায় কাঁপন, ব্যস্ত ছিলে
প্রেমে নাকি রণে?
কিছু হয়নি, কী আর হবে
হিতে বিপরীতে
হে মোহিনী, সুখে আছি
মৃতে ও অমৃতে!
ভরদুপুরে বিকেল নামা গড়িয়াহাটে
গনগনে আঁচ নেই
হাত তুলেছি, ডাকা হয়নি
এই মোহিনী, এই!
চোদ্দ বছর পরে, কেমন আছো?
সময় এলোমেলো
হে মোহিনী, ভাল থেকো
হলুদ আগুন জ্বেলো!

অনুপকুমার আচার্য

কবিতায় তিনি মগজ ও হৃদয়কে পাশাপাশি ব্যবহার করেন। কোথাও কল্পনার তীব্র আবেগ, কোথাও অভিজ্ঞতায় দগ্ধ অবশেষ তাঁর কবিতাকে উত্যক্ত করেছে। কবিতা ও গদ্যে দু'দশকেরও বেশি সময় জুড়ে তাঁর বিস্তৃতি। অনিয়মিত হলেও রয়েছে আশ্চর্য এক ধরনের মনোযোগী ধারাবাহিকতা। যাবতীয় কবিতার মধ্যেই ছড়ানো রয়েছে ছিন্ন সময়ের অস্ত্রোপচারের দাগ। অথচ সব ছাড়িয়েও এক ধরনের সময়োত্তীর্ণ মায়াবী হরিণ তাঁর কবিতাগুলিতে নিরন্তর ছুটে বেড়াচ্ছে। সেখানেই কবির সার্থকতা। শব্দ সন্ধানে তিনি সংযত অথচ নীতিবাগীশ নন। সব মিলিয়ে তাঁর কবিতাগুলি যেন দরজা-খোলা ডাক পাঠিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চায় হৃদয়ের চোরা কুঠরিতে।

১৫.১২.২০০০